ISSN :: 2454-1508
DOI Prefix: 10.69655

IIFS Impact Factor: 4.5
IJIN Impact Factor: 8.5

আত্মদীপ

আন্তর্জাতিক দ্বিমাসিক গবেষণামূলক পত্রিকা

পর্ব-২, সংখ্যা-২, নভেম্বর ২০২৫

সম্পাদক:
ড. বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য

সহ-সম্পাদক:
আজিজুল সেখ

Scanned with OKEN Scanner

ISSN :: 2454–1508 doi Prefix: 10.69655
IIFS Impact Factor: 4.5 ● IJIN Impact Factor: 8.5

CERTIFIED ISO 9001:2015 CERTIFIED

আত্মদীপ

আন্তর্জাতিক দ্বিমাসিক পিয়ার-রিভিউড গবেষণামূলক পত্রিকা

পর্ব-২, বিশেষ সংখ্যা, এপ্রিল ২০২৬

সম্পাদক: ড. বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য
সহ-সম্পাদক: আজিজুল সেখ

Scanned with OKEN Scanner

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Special Issue, April, 2026, Page No. 01-12
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.specialissue.W.428

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতায় শহর কলকাতার রূপ

মিহির মজুমদার, *সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাধাগোবিন্দ বরুয়া মহাবিদ্যালয়, গুয়াহাটি, অসম, ভারত*

Received: 27.03.2026; Accepted: 07.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Kolkata is the cultural capital of Bengal. Its heritage spans nearly three centuries. This city of Kolkata is the epicenter of all kinds of social, political, economic, and aesthetic activities of Bengal. People's curiosity and questions about it are endless. Life, livelihood, art, struggles, and aesthetics here have always been subjects of interest. Poets, artists, and painters have all left their mark of diverse talents on the heart of Kolkata. Ignoring the ravages of time, the indestructible essence of this city continues its journey through the ages. Poets and writers of different eras have depicted this city in countless ways. Many proverbial sayings in Bengali poetry have been created about this city. Here, we have focused our discussion on the context of modern Bengali poetry and the city of Kolkata. Poet Nirendranath is a renowned talent of modern Bengali poetry. Our objective is to observe how the city of Kolkata has been expressed in his works. He had a unique love for the city he knew from his youth. He viewed everything in this city with affectionate eyes. In many of his poems, the city of Kolkata has earned a special place of its own. In Nirendranath's early poems, however, the urban life is not so strongly felt. There, a pure romantic focus is observed. In the poems written in his middle age, the panorama of Kolkata begins to appear more prominently. Nirendranath draws our attention with his poetic language. His language is simple. Its significance is sharp and far-reaching. He experimented extensively with the use of rhythm in his poetry. The subject matter of his poetry is the broader human life. It is the craftsmanship of the experiences of diverse people. His focus on the consequences of life is so profound and lucid that it easily startles us. The essence of human life is the soul of his poetry.

Keywords: Kolkata, its politics, culture, modern Bengali poetry, life sketch of kolkata

'কলকাতা একদিন কল্লোলিনি তিলোত্তমা হবে'।[১] জীবনানন্দের (১৮৯৯-১৯৫৪) এই উক্তি অমরত্ব লাভ করেছে। ইতিপূর্বে মাইকেল মধুসূদন (১৮২৪-১৮৭৩) তাঁর রচিত 'একেই কি বলে সভ্যতা?' (১৮৬০) নাটকে বৈষ্ণব বাবাজির কণ্ঠে কলকাতা সম্পর্কে যে উক্তি পেশ করেছেন তাও স্মরণীয় হয়ে আছে। "এ কলকাতা মহাপাপ নগর- কলির রাজধানী, এখানে কি কোন ভদ্র লোকের বসতি করা উচিত?"[২] কবি নীরেন্দ্রনাথের পিতামহ লোকনাথ চক্রবর্তীও অনুরূপ ধারণা পোষণ করতেন। সে-কথা কবি তাঁর 'রূপকাহিনী' (১৯৮৪) কাব্যের এক জায়গায় লিখেছেন-

"স্পষ্ট করে বলো দেখি, কী হবে কলকাতায় গিয়ে,
কী লাভ উল্টোপাল্টা বাতাস বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে?"[৩]

একই কবিতার অন্যত্র লিখছেন-

"... ... ওরে দাদা,
শহর হচ্ছে রাক্ষুসে এক গোলকধাঁধা
তাই বলে কি সেখানে যেতে নেই?"

আধুনিক বাংলা কবিতার পথিকৃৎ ঈশ্বর গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯) কলকাতার 'ইয়ং বেঙ্গল' ছেলেদের ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন- "সোনার বাঙাল করে কাঙাল ইয়ং বাঙাল যত জনা।"[৪]

কলকাতা চিরকালই কবি সাহিত্যকের ভাবজগতের বিষয় হয়ে আসছে। তার সুদীর্ঘ প্রবহমানতায় নানা রূপবদলের মধ্য দিয়ে এ শহর কালস্রোতে এগিয়ে চলেছে। এই শহরের সংকট সংগ্রাম সংস্কৃতি মানবজীবন সব উপকরণ আত্মসাৎ করে নিয়ে গড়ে উঠেছে সাহিত্য। কবি নীরেন্দ্রনাথের (১৯২৪-২০১৮) রচিত কবিতায় কলকাতা শহরের নান অভিব্যক্তির প্রকাশ আছে। নিজের জীবনের ছ'বছর বয়স থেকে কলকাতাকে দেখেছেন। দীর্ঘ জীবনের নানা অভিজ্ঞাতার তিনি সাক্ষী। প্রস্তুত আলোচনায় কলকাতা শহর কবি নীরেন্দ্রনাথের কবিতায় কতখানি জায়গা জুড়ে আছে, তার মূল্যায়ন করা হয়েছে। নীরেন্দ্রনাথের প্রথম দিককার কবিতায় কলকাতা শহরের উল্লেখ পাওয়া যায় না। সেখানে বাংলার প্রকৃতি, তাঁর ফেলে আসা দিনের চালচিত্র ও কিছু রোমান্টিক অভিনিবেশ লক্ষ্য করা যায়।

এক্ষণে আমরা কবির রচিত সে-সব কবিতার দিকে নজর ফেরাব যেখানে কোনো না কোনো ভাবে কলকাতা শহরের কথা উল্লিখিত হয়েছে। যেমন-

'ফলতায় রবিবার' ('অন্ধকার বারান্দা', প্রথম সংস্করণ ১৯৬১, কাব্যের অন্তর্গত) কবিতাটিতে শহরে না যাবার প্রসঙ্গ আছে। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে-

"শহরে প্রচণ্ড ভিড়, অকারণ তুমুল চিৎকার,
নগ্ন নিয়নের বাতি। শহরে ফিরব না কেউ আর।"[৫]

বলা বাহুল্য এ শহর কলকাতা। শহরের কোলাহল ত্যাগ করে প্রকৃতির খোলা পরিবেশে, নদীর তীরের মুক্ত বাতাস সেবন করা শ্রেয় মনে করেন কবি।

'রাজপথে কিছুক্ষণ' 'নক্ষত্র জয়ের জন্য' (১৯৬৯) কাব্যের একটি কবিতা। এখানে অফিসের এক ছাপোষা কর্মচারীর অসহায়তার কথা ব্যক্ত হয়েছে। একজন সচেতন নাগরিক দপ্তের এসেছেন কলকাতা থেকে কৈম্বাটুর পর্যন্ত বাস চলাচল করানো যায় কি না তা জানতে। এ নিয়ে দপ্তর কর্মীর উষ্মা সরাসরি প্রকাশ পেয়েছ। কারণ কর্মীটি এত সাধারণ ও ক্ষমতাহীন যে তাঁর পক্ষে এত বড় সব কাজের খবর রাখা নিতান্ত বাতুলতা। শহরের রাজনৈতিক মহলের কর্তাব্যক্তিরা যে-সকল কাজের ধান্দায় ফেরেন, তাঁর মতো সাধারণ মানুষের পক্ষে সে-সবের হদিশ রাখা অসম্ভব।

" ...আমি
নেহাতই একজন ছাপোষা লোক,
টাইমের ভাত খেয়ে অফিস যাই,
অবসর-টবসর পেলে ছোট মেয়েটাকে নামতা শেখাই।"[৬]

এ কাব্যের 'বাতাসি' কবিতায় সন্তানহারা পিতৃর অসহায়তা তথা দিশেহারা অবস্থার চিত্র আছে। পিতার কণ্ঠে উচ্চারিত আর্ত ডাকের কারণ কী, সে-কথা জানার কোনো উপায় নেই। অথচ এমন আকছার ঘটছে কত ঘটনা। তার কেবল সংকেত থেকে আসল কথাটা উদ্ধার করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। কবি বলছেন-

"গল্পের সবটা আমি পাব না নাগালে।
শুধু শুনে যাব। শুধু এখানে ওখানে,
জনারণ্যে, বাতাসের ভিতরে, হাটেমাঠে,
অথবা ফুটপাথে, কিংবা ট্রেনের জানলায়
টুকরো-টুকরো কথা শুনব, শুধু শুনে যাব।"[৭]

'নক্ষত্র জয়ের জন্য' বইয়ের ভিন্নস্বাদের একটি কবিতা 'কিচেন গারডেন'। কবিতাটিতে কলকাতা শহরে শাক-সবজির ফসল ফলে ওঠার বিবরণ আছে। উত্তর-দক্ষিণ সমস্ত কলকাতা জুড়ে এই আবাদ দেখে কবি চমৎকৃত বোধ করছেন। গোলাপের চাষ দরিদ্র শহরবাসীর কাছে শৌখিনতা।

"এখন চিচিঙ্গে, লাউ, ঢ্যাঁড়শের উদ্দেশ্যে ধাবিত
জনতাকে ফেরানো যাবে না।"[৮]

'কলকাতার যীশু' (১৯৬৯) কাব্যের একটি কবিতা 'মধ্যরাতে, ঘুমন্ত শহরে'। এই কবিতায় নিদ্রা-নিমগ্ন কলকাতার চিত্র বর্ণিত আছে। তাতে বলা হয়েছে, ইন্দিরা বলে কাউকে ভীষণ জোরে ডাকা হলে সেই শব্দে পরিপার্শ্বের চিত্র বদলে যেতে থাকে। বৃদ্ধেরা, যাদের ঘুম কম হয়, তারা উৎকর্ণ হলেন। শিশুরা ঘুমের মধ্যে কেঁদে উঠল। এবং দালানবাড়ির জানলাগুলো এক এক করে খুলে গেল। এই নৈশচিত্র কলকাতার। কবি লিখছেন-

"মধ্যরাতে পৃথিবীর তীব্রতম ডাক তাই দেয়ালে-দেয়ালে
প্রতিহত হতে-হতে
অর্থহীন হয়ে যায়।
যাকে ডাকা, সে আসে না,"[৯]

রাতের বেলা কাউকে ডেকে সাড়া না-পাওয়ার চিত্র শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের (১৯৩৩-১৯৯৫) একটি কবিতায়ও প্রশস্তি লাভ করতে দেখি, পরবর্তী কালে। কবিতাটির নাম 'অবনী বাড়ি আছো'। 'ধর্মে আছো জিরাফেও আছো' (প্রথম প্রকাশ- আশ্বিন, ১৩৭৫) কাব্যে কবিতাটি সন্নিবিষ্ট আছে। কবিতার সেই প্রবাদপ্রতিম উচ্চারণ-

"দুয়ার এঁটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া
কেবল শুনি রাতের কাড়ানাড়া
অবনী বাড়ি আছো?"[১০]

এই নাগরিক জীবনের সম্পর্ক ও সম্পর্কহীনতার পাঠ আমাদের বিষণ্ণ করে। জীবন নির্বাহের এ এক ব্যাধি। নিরাময়ের উপায়হীন অস্বস্তিকর অবস্থা।

এ কালের প্রধান ভাষ্যকার কবি শঙ্খ ঘোষ (১৯৩২-২০২১) তাঁর 'সকাল দুপুর সন্ধ্যা' কবিতায় শহরের বিবর্ণ চিত্র অঙ্কন করেছেন।

"আঁকিবুকি গলি, পথ, দোকান-পসার, ছোট সিঁড়ি
অন্ধকার ভিজে ঘর কুকড়ে থাকে মলিন ভিখিরি
... ...
কী ভাষা, পিপাসা তার মেটেনি মেটেনি তার কোনোদিন-

সমস্ত দুহাত ভ'রে এ শহর ফিরে চায় ঋণ,"[১১]

'কলকাতার যীশু' (১৯৬৯) কাব্যের 'অন্য আকাশের দিকে' কবিতায় মুক্ত আকাশ হারানোর ছবি কবি অঙ্কিত করলেন। একটি চিলের খোলা আকাশে উড়ে বেড়ানোর আনন্দ ও স্বাধীনতার সুখ কবিকে নস্টালজিক করে তোলে। কবি সেই মুক্ততা আর খুঁজে পান না কলকাতা শহরে। বলছেন-

"কলকাতায় আছি। তবু মাঝে-মাঝে মনে হয়,
আর-কোথাও আছি।
এক-এক সময়
ফুটপাথ-বাজার-বস্তি ধসে পড়ে,
চতুর্দিকে
সমস্ত কঠিন হর্ম্য ঝাপসা হয়ে দূরে সরে যায়"[১২]

এই কাব্যের 'মাঝে মাঝে এই রকম' কবিতায় চিত্তের রূপবদলের কথা লিখেছেন কবি। জীবনের নানা অভিঘাতে মানুষের চিত্ত নানা ভাবে বিচলিত হয়। আনন্দে, বিরাগে, বিমূঢ়তায় তার নানা স্ফূরণ আমাদের সচকিত করে। বিশেষত চিত্ত যখন অকারণ পুলক অনুভব করে, তখন তার ভাবগতিক একটু অন্যরকম হয়। সেই কথাই এই কবিতাটিতে লিখলেন-

"শ্যামবাজারের পাঁচমাথায় দাঁড়িয়ে
প্রত্যেককে ডেকে-ডেকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে : কেমন আছেন?"[১৩]

অন্যত্র 'জমেছে নতুন রঙ্গ' কবিতায় নগর কলকাতার জনমানসের চিত্র আছে। নাগরিক মন কী ভাবে দৈনন্দিন নানা আর্থসামাজিক ওঠাপড়ায় নিজেদের বদলে ফেলে, তা-ই কবি রঙ্গ হিসেবে দেখছেন। অস্তিত্বের এই রূপবদল কদর্য লাগে। এই মানুষগুলো সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ নয়। এঁরা সমাজে নানা পেশায় যুক্ত আছে। এবং নিজের স্বর্থবুদ্ধির পাকদণ্ডীতে বাঁধা পড়ে আছে। কবির ভাষায়-

"একজন বস্তুত-ভাঁড় মনস্বীর ভূমিকায় মঞ্চে নেমেছেন।
মুখশ্রী পালটিয়ে যায় দ্রুত পরিবর্তিত আলোকে,
কয়েকটি চতুরকে যায় চেনা।
জমেছে নতুন রঙ্গ কলকাতায়, দর্শকের চোখে
পলক পড়ে না।"[১৪]

বলা বাহুল্য নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বিখ্যাত কাব্যগুলির একটি এই 'কলকাতার যীশু'। এই কাব্যের নাম কবিতাটির দিকে লক্ষ্য করা যাক। কবিতাটিতে একটি সদ্য হাঁটতে শেখা শিশুর কথা আছে। যে-শিশু টালমাটাল পায়ে কলকাতার গাড়ি-ঘোড়া-লোক-লস্করের ভিড়ে-ঠাসা রাস্তা পার হচ্ছে। তাই দেখে কবির মনে অভূতপূর্ব ভাবানুভূতির সৃষ্টি হয়েছে।

"ভিখারি-মায়ের শিশু,
কলকাতার যিশু,
সমস্ত ট্রাফিক তুমি মন্ত্রবলে থামিয়ে দিয়েছ।"[১৫]

নির্বোধ শিশুটির প্রথম পথচলা, এবং উদ্যত মৃত্যু সম্পর্কে উদাসীনতা, এই দুটি বিষয়ের দিকে কবি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত করেন। সদ্য হাঁটতে শেখার আনন্দ, বিশ্বকে হাতের মুঠোয় পেতে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, শিশুটির এই অভিব্যক্তি মনোমুগ্ধকর। পুরাকালের যিশুর নির্ভীক নির্মল মানবহৃদয় এই কবিতায় ব্যঞ্জিত হয়েছে। কলকাতা শহরের এই ছবি বাংলা কবিতায় কবি নীরেন্দ্রনাথের হাতে এক অবিনশ্বর রূপ লাভ করেছে।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ এবং বহুপঠিত কাব্য 'উলঙ্গ রাজা' (১৯৭১)। এই কাব্যে সাতের দশকের উত্তাল কলকাতার দিনগুলির চিত্র ও তার নানা ব্যঞ্জনা উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন 'লক্ষ্মণ-বিচার' কবিতায় সরাসরি প্রতীক ও রূপকের আড়ালে এক ভায়বহ অসুস্থার কথা আমরা জানতে পারি, যে-অসুখ কোনোদিন সারবার নয়। শহরে দাঙ্গা শুরু হলে, সেই সাতের দশকের কলকাতা কী রূপ পেত তার ছবি এই কবিতায় কবি তুলে ধরলেন।

"রাস্তায় নেমে বাস পেলুম না,
কোথায় কী গণ্ডগোল হয়েছে, তাই
বাস-ট্রাম বন্ধ।
বাতাসে অ্যামোনিয়ার ঝাঁঝালো গন্ধ,
কাছে কোথাও আচমকা একটা পটকা ফাটতেই
কটাকট কটাকট তার জবাব পাওয়া গেল।"[১৬]

'কাঁচের গুঁড়ো' কবিতায়ও অনুরূপ ছবি ফুটে উঠেছে। সারা শহর জুড়ে রক্ত ঝরছে। গুলি ও বোমা ফাটেছ। তার শব্দ শোনা যাচ্ছে। এ সবের মধ্যেও মানুষের বাঁচার স্বপ্ন, নৈমিত্তিক জীবন কীভাবে অটুট থাকছে, সেই জীবনতৃষ্ণার এক মরমী রূপ কবি অপূর্ব ছন্দে গেঁথে তোলেন।[১৭] অনুরূপ 'ভয় করলেই ভয়' কবিতাটি। এখানে কবি অন্যত্র বেরিয়ে পড়ার কথা বললেন। যাবতীয় হিংসা, মৃত্যু, অপঘাতের ভয়কে উপেক্ষা করেই বেরিয়ে পড়ার কথা বলা হয়েছে। কেননা তা না-হলে কোথাও পৌঁছানো যাবে না। কবি লিখেছন-

"জানি, রাস্তা এখন ক্রমেই আরও তেতে উঠছে।
উঠুক।
ঘরই জ্বলে, রাস্তা কে আর জ্বালায়?
দেখতে পাচ্ছি,
ওদের চোখে বিন্দু-বিন্দু রক্ত ফুটছে।"[১৮]

'উলঙ্গ রাজা' কাব্যের উল্লখযোগ্য কবিতা 'কবিতা ৭০'। কবিতাটি শুরু হয়েছে এভাবে-

"এক-একটা কবিতা যেন সুতানুটি-গোবিন্দপুরের
রাত্রিকে ফিরিয়ে আনে।
এক-একটা কবিতা যেন অকস্মাৎ
টান্ মেরে হটিয়ে দেয় ময়দানের সবুজ গালিচা।
... ...
এক একটা কবিতা গিয়ে ফেটে পড়ে চৌরঙ্গী পাড়ায়।
বৃক্ষেরা আমূল কাঁপে, ভয়ার্ত পাখিরা
ঝাঁকে-ঝাঁকে
বিপন্ন আশ্রয় ছেড়ে রাত্রির আকাশে উড়ে যায়।"[১৯]

এখানে কবিতার ইতিহাস ও সময়ের ইতিহাস মাখামাখি হয়ে আছে রূপকে আর প্রতীকে। সুদীর্ঘকালের কলকাতা শহরের কাব্যচর্চার ইতিহাস এখানে প্রচ্ছন্ন। তার পরিবর্তে কালের পদচিহ্ন কবি আঁকতে চাইলেন। নিরবচ্ছিন্ন জীবনচলার ছন্দ ও তার উত্তাল তরঙ্গ নানা আর্থসামাজিক অভিঘাতে কীভাবে উচ্ছল হয়ে উঠেছিল কলকাতার বুকে, তারই রূপরেখা এই কবিতা।

'হ্যালো দমদম' কবিতায় কলকাতা শহরের বন্যার ভয়াবহতার কথা পাই। পিচ বাঁধানো শহরের রাস্তা জলে থই থই করছে। পায়ের কাছে মাছেরা খেলা করছে। চারদিকে নালা-নর্দমা ডুবে কালো জল ধেয়ে আসছে। অসহায় শহরের মানুষ উদ্ধার পাবার জন্যে নির্দিষ্ট দপ্তরে অহরহ ফোন করে চলেছ, 'হ্যালো দমদম'। বাড়ির শখের জুঁইলতা জলের তলায় তলিয়ে গেল। কখন রেসক্যু বোট আসবে। অসুস্থ জ্বরাক্রান্ত মেয়ের শোবার ঘরে ঢুকে পড়ে নেড়ি কুকুর ও একরাশ কচুরিপানা।

নীরেন্দ্রনাথের তিনটি কাব্য 'খোলামুঠি' (১৯৭৪) 'কবিতার বদলে কবিতা' (১৯৭৬) 'আজ সকালে' (১৯৭৮) এই তিনটি কাব্যগ্রন্থে কলকাতার প্রসঙ্গ নেই। এবং 'পাগলা ঘন্টি' (১৯৮১) কাব্যের প্রথমদিকের কবিতাগুলিতে নগরায়নের কথা আছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০৩) তাঁর 'চিরকুট' (১৩৫৭) কাব্যর 'স্বাগত' কবিতায় যেমন বলেছিলেন-

"গ্রাম উঠে গিয়েছে শহরে-
শূন্য ঘর, শূন্য গোলা,
ধানবোনা জমি আছে পড়ে।"[২০]

অনুরূপ নীরেন্দ্রনাথের 'হাইওয়ে' কবিতায় দেখি মেদিনীপুরের ছেলে গোবিন্দ দেউলিয়াবাজারের চায়ের দোকানে কাজ করে। ধান চাষের বদলে পদ্ম আর রজনীগন্ধার চাষ করা হয় জমিতে। এবং তা ট্রাকবোজাই হয়ে চলে আসে কলকাতায়। 'পাগলা ঘন্টি' কাব্যের একটি কবিতা 'পেঁচি'। এটি ব্যঙ্গাত্মক কবিতা। শহুরে জীবনে যে ভাঁড়ামি গাঁজিয়ে উঠেছে দিনের পর দিন, কবি তার প্রতি কটাক্ষ করেছেন। এখন শহরে মাতলামি বিক্রি হয়। যে শুঁড়ি, তার সাক্ষীকেই প্রতিভা বলে গণ্য করা হয়। অথচ এমনটা তো হবার কথা ছিল না। তাই কবি শ্লেষ ভরে বলে উঠেন- ''মাতলামি প্রতিভা বলে গণ্য হচ্ছে কলকাতা শহরে।''[২১] কিন্তু 'পাগলা ঘন্টি' নামক নাম কবিতাটি কলকাতার যাবতীয় অপূর্ণতার ছবি এঁকে রেখেছে। পাগলা ঘন্টি যেমন চলমান জীবনকে টলিয়ে দেয়, নাড়িয়ে দেয় বিষম ভাবে, ঠিক তেমনি কবি এমন একজনকে আহ্বান করেন কলকাতার রূপ পালটে দিতে। কলকাতার সবকিছু সুন্দর করে দিতে। কবির ভাষায়-

"বলি, চলো, কলকাতায় যাই,
পাতাল-রেলের জন্যে মাটি খুঁড়ি, সুড়ঙ্গ বানাই"[২২]

কিন্তু কবির আহ্বান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, কেননা ভোরের হাওয়া পাগলা-ঘন্টির মতো জানান দিয়ে যায়, যাকে কবি খুঁজছেন, সে সুবর্ণরেখা নদীর বাঁকে মিলিয়ে গেছে। আর কোনোদিন ফিরে আসবে না। তবু আশাবাদী কবি তাকে ডেকে চলেছেন।

'ঘর-দুয়ার' কাব্যটি ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এই কাব্যের 'পুরনো ছবি' কবিতায় মূলত পুরনো কলকাতার ছবি কবি অঙ্কন করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্যাসের বাতি জ্বালাবার জন্যে মই কাঁধে ফেরা লোকটি, হাঁড়িমাথায় মালাই বরফ বিক্রেতা, ঝাঁকা মাথায় বেলফুল বিক্রেতা থেকে আরম্ভ করে যতসব ফিরিওলার স্মৃতি কবি ফুটিয়ে তুলেছেন। আরও একজন রয়েছে যাকে আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। সেই বিশ্বাস সেই ভালবাসা, যার অভাব চিরকাল কলকাতায় থেকে যাবে, দিনবদলের ঢেউয়ে যা সত্যি হারিয়ে গেছে। এমনই রসের আরেকটি কবিতা 'জয় কালী'। কবিতাটিতে পঁয়তাল্লিশ বছর পুরনো বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাতের রোমাঞ্চের কথা আছে। বাল্যকালের স্মৃতি সব আছড়ে পড়েছে দুজনের মনে ও প্রাণে। যে-কলকাতা শহরকে বিশ্রী স্বাদহীন মনে হত, তা নিমেষে স্মৃতির সবুজ রঙে মোহময় হয়ে ওঠে। এতদিন যে-জীবন সাংসারিক দায়-দায়িত্বে ন্যুব্জ হয়ে পড়েছিল তা মুহূর্তেই প্রাণ পেয়ে ওঠে। আকাশে পুজোর গন্ধ, কলকাতার গঙ্গা থেকে ছুটে আসে হাওয়া।[২৩]

আবার 'সময় বড় কম' (১৯৮৪) কাব্যে জীবনের উপলব্ধি, বার্ধক্যের বোধ এসবই মূল সুর। তবে বিক্ষিপ্ত ভাবে হলেও কলকাতার কিছু অনুষঙ্গ আছে। যেমন একটি কবিতা 'লালদিঘিতে বৃষ্টি' এখানে আকাশের উৎপ্রেক্ষায় কবি স্নানরতা রমণীর সৌন্দর্যের রূপ এঁকেছেন। শেষে সমাসোক্তি অলঙ্কারের প্রয়োগ কবিতাটিকে মনোমুগ্ধকর করে তুলেছে।[২৪] অপর একটি কবিতা 'ভুল ভাঙছে'। এতে কবি সমকালীন কলকাতার এক কদর্য রূপ তুলে ধরলেন। রাজনৈতিক বাতাবরণ ও সামাজিক ব্যবস্থার এক অবক্ষয়িত রূপ আমরা এই কবিতাটিতে দেখতে পেলাম। কবিতাটিতে বলা হয়েছে কিছু মানুষ মুখোশধারী, তারা লোকের জীবন ছারখার করে দিয়ে উল্লাস করে। মনুষ্যত্বের এই অবমাননার প্রতি কবি সোচ্চার হয়েছেন।[২৫]

কবির অপর একটি কাব্য 'যাবতীয় ভালবাসাবাসি' (১৯৮৬)। এর প্রথম কবিতা 'আশ্বিনে'। কবিতাটিতে কলকাতার বউবাজারের প্রসঙ্গ আছে। কবি লিখেছেন, বাজারের দোকানগুলিতে লুট হয়ে গেছে সোনা। সেই সোনারঙ দিয়ে আশ্বিন আলপনা আঁকে। এই বইয়ের নাম কবিতা 'যাবতীয় ভালবাসাবাসি'-তে আবার কলকাতার দেবশিশু সেই 'যিশু'র প্রসঙ্গ এসেছে। মধ্যরাতে মানসপটে কবি দেখতে পান আধডোবা জাহাজের মতো শহরটা ডুবছে। ঝড়-ঝাপটে কেঁপে উঠছে লক্ষ-লক্ষ তারা। আর তাঁর চোখের সামনে ভাসতে থাকে সেই দেবশিশু। সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক কবিতা 'দুঃখী নগর'। এই নগর কলকাতা। সে বেহুলার মতো দুঃখী। অনন্ত নৈরাশ্যের মধ্যে ভাসতে-ভাসতে, বেহুলা যেমন স্বর্গে ঢুকে পড়েছিল, কলকাতাও সুন্দর আলোর বৃত্তে ঢুকে পড়ে।[২৬] কলকাতাকে কেউ কেউ মিছিলের নগর বলেছেন কবি তাঁদের সঙ্গে একমত নন। কেউ বলেছেন দুঃস্বপ্নের নগর, তাতেও কবির সম্মতি নেই। তাঁর ভাষ্য এই নগর দুঃখী নগর এবং বড় অভিমানী।

নীরেন্দ্রনাথের রচিত পরবর্তী কাব্য 'ঘুমিয়ে পড়ার আগে' (১৯৮৭)। এখানে বেশ কয়টি কবিতায় কলকাতার প্রসঙ্গ বিবৃত হয়েছে। 'কালবৈশাখী' কবিতায় কলকাত শহরে ফুটপাথের কিনারে হেঁটোয়-কাঁটা গাছের কথা আছে। কবি বলছেন-

> ''বিকেলবেলার শহর এখন শুয়ে আছে
> বেহুঁশ জ্বোরো রুগির মতো।''[২৭]

এই কাব্যের উল্লেখযোগ্য কবিতা 'পদ্মাপার থেকে গঙ্গাতীরে'। কবি বলছেন তাঁর শৈশব কেটেছে পদ্মাপারে আর যৌবন কেটেছে গঙ্গাতীরে, কলকাতায়। তিনি দেখলেন, জঞ্জালের ভার টানতে-টানতে মস্ত একটা নদী কীভাবে নর্দমা হয়ে গেল। অথচ এই নদী পদ্মাপারের মতো পাগলের ন্যায় খেপে ওঠে না। শহরের স্ট্র্যান্ড রোডের ভিকিরি ও চোর, শ্মশানের ডোম, নিষিদ্ধ পল্লির নাগরিক ছাড়া গোটা কলকাতা শহর যখন ঘুমে তখন নদী নিজে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে আসে। তখন নদীকে রহস্যময়ী নারী মনে হয়।[২৮]

'জঙ্গলে এক উন্মাদিনী' কাব্যের (১৯৮৯) নামকবিতাটি বড় মারাত্মক বিষয় নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত। কবিতাটিতে একটি উন্মাদিনীর অসহায়তার গল্প পরিস্ফুট হয়েছে। কোনো শহুরে দুর্বৃত্ত কর্তৃক উন্মাদিনী গর্ভবতী হয়েছে এবং সন্তানপ্রসব করেছে রাস্তায়। জনৈক বিজনচন্দ্র বিশ্বাসের বাড়ির সামনে পাগলির জীবনের নির্মমতাকে উপভোগ করার জন্যে সমবেত জনতাকে পাগলি যখন প্রাগৈতিহাসিক ক্রোধে নিঃশেষ করে দিতে উদ্যত, তখনই জনতা বিকট হাস্যে ফেটে পড়ছে। অথচ বিজনবাবুর বাড়ির কাজের মানুষ পারুলবালা ওই পাগলির নবজাতককে কোলে করে ঘরে নিয়ে গেল। আর যেতে যেতে সমবেত শহুরে জনতার উদ্দেশ্যে একদলা থুথু ছিটিয়ে বলে গেল, বাঘসিংহ-ভরা জঙ্গলে পাগলদেরও নিস্তার নেই। কলকাতা শহরের এমন কদর্য রূপ বাংলা কবিতায় চোখে পড়ে না।[২৯]

'আয় রঙ্গ' (১৯৯১) কাব্যের একটি স্মৃতিভারাতুর কবিতা 'প্রাণ-ভোমরা', তাতে কবি তাঁর দাদুর কথা স্মরণ করে লিখছেন-

"... যে থাকতে চায়
মুরগি রাখার ঘরে,
গ্রাম ছেড়ে সেই উজবুক যায়
কলকাতা শহরে"[৩০]

এ নিয়ে কবি সহমত হতে পারেননি। কলকাতার প্রাণ-ভোমরা কোথায় তা তিনি জানেন। ঘুপচি ঘরের ভালবাসায়। এই কাব্যে 'কলকাতা-৩০০' এই নামে একটি কবিতা রয়েছে। এটি কলকাতা শহরের তিনশো বছর পূর্তি কীভাবে পালিত হচ্ছে তারই বিবরণ। কবিতাটি তির্যক। কিছুটা ব্যঙ্গের ভঙ্গিতে লেখা। দেখানো হচ্ছে কলকাতা শহর প্রথম জন্মদিনে কেমন ছিল। তাতে উঠে আসছে সুতানুটি গ্রামের গভীর অন্ধকার রাত্রি। মশা উড়ছে, শিয়াল ডাকছে, ফিরে এসেছে গোবিন্দপুরের আতঙ্ক। আর শ্মশানকালী পুজোর নরবলির দৃশ্য।

অন্যদিকে 'চল্লিশের দিনগুলি' প্রকাশিত হয় ১৯৯৪ সালে। কাব্যের নামে প্রকাশ তার বিষয়বস্তু। চল্লিশের দশকের উত্তাল ঘটনার তাপ সরাসরি এই কাব্যের কবিতাগুলিতে লেগেছে। নামকবিতাটি কাব্যের প্রথমেই স্থান পেয়েছে। তাতে কবি জানাচ্ছেন কলকাতা শহরের সঙ্গে তিরিশের দশকের সূচনায় তাঁর পরিচয় ঘটেছিল। তখনই কলকাতা নিজেকে আমূল পালটে ফেলার জন্যে তৈরি হচ্ছিল। উনচল্লিশে মহাযুদ্ধ, বিয়াল্লিশে আন্দোলনের আগুন, মেদিনীপুরের ধান খেতে ভাসছিল চাষির লাশ, কলকাতার ফুলবাগানে উড়ছিল শ্মশানের ছাই, আর তেতাল্লিশে দুর্ভিক্ষ। জাপানি বোমার ভয়ে কলকাতা ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। কী দেখায়নি কলকাতা শহর-মন্বন্তরে এক স্কুল বালিকা তার টিফিনের খাবার উপুড় করে দিচ্ছিল ভিকির মায়ের ঝুলিতে। ছেলের হাত থেকে ভাতের থালা কেড়ে নিয়ে হাসছিল উন্মাদিনী মা।[৩১]

'কবি চেনে, সম্পূর্ণ চেনে না' (২০০১) গ্রন্থের দু-চারটি কবিতায় কলকাতার প্রসঙ্গ এসেছে। একটি কবিতার নাম 'চোখের সামনে'। এই কবিতায় চলমান কলকাতার দৃশ্যপট চিত্রিত হয়েছে। কবিতাটি বিবরণধর্মী। এখানে নেই কোনো ইশারা। ভাবের ব্যঞ্জনা নেই। শুধু একটা ছবি আমরা দেখতে পাই। এক ট্রাফিক পুলিশ গ্রাম থেকে আসা বছর চারেকের ছেলেক কাঁধে তুলে রাস্তা পার করে দিচ্ছে। সঙ্গে তার গ্রামবাসিনী মা। যে কলকাতা শহরে প্রথম এসেছে। এবং যানবাহনের ঘোর চক্করে পড়ে রাস্তা পার হতে পারছিল না। শহুরে পুলিশের কর্তব্যজ্ঞান এবং মানবিক দায়িত্বের প্রতি কবির সস্নেহ দৃষ্টিপাত আমাদের চকিত করে। কারণ শহুরে মানুষ যেন এ দৃশ্য দেখতে অভ্যস্ত নয়। কবি লিখছেন-

"খালি পায়ে
জড়সড় হেঁটে চলেছে মাথায়-ঘোমটা,
কপালে-তেল-জবজবে-সিঁদুরের-টিপ,
পরনে-জংলা-শাড়ি,
সম্ভবত এই শহরে সদ্য-আসা একটি
বউ-মানুষ"[৩২]

এ কাব্যের অন্য একটি কবিতা 'স্মৃতির গলিতে আজও'। এখানে কবি স্মৃতিকাতর। কলকাতার পুরনো যাপনচিত্রের দৃশ্যপট তাঁর মানসপটে ভেসে ওঠে। এখন কলকাতা শহরের বুকে সেইসব পুরনো ছবি চোখে পড়ে না। যারা মই কাঁধে করে সন্ধার প্রাক্‌কালে বাতিদানে বাতি জ্বালাত তারা কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। এখন এত নিয়ন বাতি জ্বলে। তবুও কলকাতার আঁধার কাটে না। এই আঁধার ব্যঞ্জনার্থক। শহুরে জীবনের নির্মম ব্যাধি হল সম্পর্কহীনতা। তাই ঘন আঁধারের মতো মানবজীবনে চেপে বসেছে। কবি তাই সততই স্মৃতিকাতর হয়ে পড়েন। কবি লিখছেন-

"পুরনো সমস্ত-কিছু যেমন ক্রমশ চলে যায়,
ঝাঁকা নিয়ে তুমিও গিয়েছ, ফিরিওলা।
সকালে মাকখন গোলি, দুপুরে খাগড়াই
বিষ্টুপুরী বাসন-বিক্রেতা,"[৩৩]

'কবি চেনে, সম্পূর্ণ চেনে না' এই নাম কবিতাটি বড় মধুর। জীবনের বিষণ্ণ কিছু দিক কবি এখানে তুলে এনেছেন। কবিতাটি সাতটি পর্বে সাজানো। প্রথম পর্বে মিতুল নামের এক শিশুর কথা আছে। শিশুটি অসুস্থ। কলকাতার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে। বেশিদিন বাঁচবে না সে। সবাই মিতুলকে গোপাল বলে ডাকে। বিশেষত হাসপাতালের নার্সরা। তিনমাস ধরে সে ওখানে আছে। সবাইকে মাতিয়ে রেখেছে। অথচ তার দেহে বইছে মৃত্যুর বিষ। আনন্দ ও বেদনার যুগল মূর্তি দেখে আমাদের বিষাদ জাগে। দ্বিতীয় পর্বে একটি কিশোরীর কথা আছে। যে-কিশোরী স্বভাব-চঞ্চল। হাসিতে আড্ডায় আশপাশের সকলকে মাতিয়ে রাখে। এখন সে ছাতিমগাছের তলায় বাসন্তিক ছায়া মেখে পরীক্ষার পড়ার খাতায় শেষবারের মতো চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে। তার এই হালফিল ভাবগম্ভীরতায় তাকে চেনা যাচ্ছে না। কবি ওকে দেখতে বলছেন। তৃতীয় পর্বে আছে একটি কিশোর বালকের কথা। বালকটি দরিদ্র। দেউলিয়াবাজারে চায়ের দোকানে কাজ করত। সপ্তাহখানেক হল সে কাজ হারিয়েছে। এখন সে রূপনারানের কূলে বসে থাকে আনমনা। জীবনের কোন মানে খোঁজে কেই-বা জানে। লোকে এই ছেলেটিকে না চিনলেও কবি ওকে চেনেন।

কবিতাটির চতুর্থপর্বে আছে সত্তর দশকের কলকাতার রাজনৈতিক পরিস্থিতির ভয়াবহতার গল্প। এখানে এক দুঃখী মায়ের ছবি অঙ্কন করেছেন কবি। মা জানলার শিক ধরে মাঝরাতে দাঁড়িয়ে আছেন। কখন তাঁর ছেলে এসে মাঝরাতে মা বলে ডেকে ওঠে, এই প্রতীক্ষায়। কবি লিখছেন-

"যে-ছেলে ভাত খেতে বসেছিল, তাকে বন্ধুরা কোথায়
ভাতের থালার থেকে তুলে নিয়ে গেল,
কেন নিয়ে গেল, কাকে মুক্ত করতে এই
মুক্তির দশকে,"[৩৪]

এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের (১৯১৯-২০০৩) 'যত দূরেই যাই' (১৯৬২) কাব্যের 'কেন এল না' কবিতাটির কথা, সেখানেও স্তব্ধ অপেক্ষার করুণ চিত্র আছে। একটি ছেলে বাবার আগমনের প্রতীক্ষায় আছে। বাবা এলে পুজোর জামা কেনা হবে। কিন্তু অফিস থেকে বাবা সারাদিন এলো না। মায়ের দুশ্চিন্তা। গৃহকাজে ভুল হচ্ছে উদ্বেগের আতিশয্যে। শেষমেষ ছেলেটি বাবার খোঁজে গলির মোড়ের দিকে এগিয়ে গেলো। তার তর সইছিল না। একটু পরে একটি কালো গাড়িতে বন্দুকধারী লোকজন এলো। বোমাবাজি চললো। মাঝরাতে বহু মৃত্যুর পাশ কাটিয়ে বাবা বাড়ি ফিরে এলেও, ছেলে কিন্তু এলো না। এই সেই মুক্তির দশকের কলকাতার চলচিত্র। সাধারণ মানুষের জীবনের কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। কবির ভাষায় চিত্রটা এরকম-

"তারপর অনেক রাত্তিরে
বারুদের-গন্ধে-ভরা রাস্তা দিয়ে
অনেক অলিগলি ঘুরে
মৃত্যুর পাশ কাটিয়ে
বাবা এল।
ছেলে এল না।।"[৩৫]

নীরেন্দ্রনাথ-পরবর্তী কবিতায়ও কলকাতা প্রবল ভাবে উপস্থিত। এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আমি ও কলকতা' কবিতার কথা। যাতে কবি লিখেছেন-

"কলকাতা আমার বুকে বিষম পাথর হয়ে আছে
আমি এর সর্বনাশ করে যাবো-
আমি একে ফুসলিয়ে নিয়ে যাবো হলদিয়া বন্দরে"[৩৬]

এ ছাড়া আছে সুনীলের সেই বিখ্যাত কবিতার (নীরার অসুখ) পংক্তি-

"নীরার অসুখ হলে কলকাতার সবাই বড় দুঃখে থাকে"[৩৭]

সমকালের আরেক কবি শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'মত্ত অবস্থায় রচিত' নামক কবিতায় লিখেছেন-

"রাত বারোটার পর কলকাতা শাসন করে চারজন যুবক"[৩৮]

এমন অজস্র উদাহরণ টানা যায়। কলকাতা এমনই স্বপ্ন ও দুস্বপ্ন বুনে দিয়েছে কবিদলের মনোজগতে। নীরেন্দ্রনাথ তাঁর 'গল্পের বিষয়' নামক কবিতায় তিন বন্ধুর এক আলোচনা পেশ করেছেন, যাতে মূল বিষয় হল কলকাতা শহর। এই শহরের বিভিন্ন স্থানে তিনজনের হামেশাই দেখা হয়। বলছেন গল্পের বিষয় এখনকার মানুষ বুঝবে না। মধ্য কলকাতার এক গলি যা কিনা রাত বারোটায় সবুজ আলোয় সাঁতার কাটতে-কাটতে স্বপ্ন দেখত হরেক রকম। কথা হয় অঘ্রানের ঘোলাটে আকাশ নিয়ে। যে আকাশে শীলেদের বাড়ির ছেলের বিয়ের রাত্তিরে আলোর নেকলেস পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমরা বঝতে পারি কবির মনোভূমি জুড়ে একটা বিরাট বড় জায়গা নিয়ে আছে প্রিয় কলকাতা শহর।

তথ্যসূত্র:

১। দাশ, জীবনানন্দ। শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি (২য় সংস্করণ, সপ্তম মুদ্রণ)। ১৯৮৮, কল-৭৩, পৃ. ৫৮।
২। দত্ত, মাইকেল মধুসূদন। একেই কি বলে সভ্যতা? (সম্পাদনা- নির্মলেন্দু ভৌমিক)। শিলালিপি, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ (২য় মুদ্রণ) ২০০০, পৃ. ২।
৩। চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ। রূপ-কাহিনী (কবিতা সমগ্র-৩)। আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ (চতুর্থ মুদ্রণ), ২০১৬, কল-৯, পৃ. ৫৭-৫৯।
৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত। মডার্ন বুক এজেন্সি প্রা.লি.,(পরিবর্ধিত সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ ২০১১, কলকাতা-৭৩, পৃ. ২৬৫।
৫। চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ। অন্ধকার বারান্দা (কবিতা সমগ্র-১)। আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ (দশম মুদ্রণ), ২০১৫, কল-৯, পৃ. ৭৯।
৬। চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ। কবিতা সমগ্র-৩। (সংযোজনা) আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ (চতুর্থ মুদ্রণ), ২০১৬, কল-৯, পৃ. ৩০৩।
৭। চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ। নক্ষত্র জয়ের জন্য (কবিতা সমগ্র-১)। আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ (দশম মুদ্রণ), ২০১৫, কল-৯, পৃ. ১৬৭।
৮। তদেব, পৃ. ১৮৮।
৯। চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ। কলকাতার যীশু (কবিতা সমগ্র-১)। আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ(দশম মুদ্রণ), ২০১৫, কল-৯, পৃ. ২১৩।
১০।https://dn790009.ca.archive.org/0/items/ShaktiChattopadhyayerSreshthoKobita/ShaktiChattopadhyayerSreshthoKobita.pdf পৃ. ৪১

১১। https://dn721903.ca.archive.org/0/items/in.ernet.dli.2015.454580/2015.454580.Kabitasangraha.pdf, পৃ. ৫৯।
১২। চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ। কলকাতার যীশু (কবিতা সমগ্র-১)। আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, (দশম মুদ্রণ) জুলাই, ২০১৫, কল-৯, পৃ. ২২০।
১৩। তদেব, পৃ. ২২৬।
১৪। তদেব, পৃ. ২২৮।
১৫। তদেব, পৃ. ২৩০।
১৬। চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ। উলঙ্গ রাজা (কবিতা সমগ্র-২)। আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, (সপ্তম মুদ্রণ) মে, ২০১৬, কল-৯, পৃ. ১২।
১৭। তদেব, পৃ. ২৫।
১৮। তদেব, পৃ. ২৬।
১৯। তদেব, পৃ. ২৯-৩০।
২০।https://ia601305.us.archive.org/25/items/in.ernet.dli.2015.303156/2015.303156.Subhas-Mukhopadhyayer.pdf. পৃ. ৫৯
২১। চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ। পাগলা ঘন্টি (কবিতা সমগ্র-২)। আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, (সপ্তম মুদ্রণ) মে, ২০১৬, কল-৯, পৃ. ১৬৫।
২২। তদেব, পৃ. ১৬৭।
২৩। চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ। ঘর-দুয়ার (কবিতা সমগ্র-২)। আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, (সপ্তম মুদ্রণ) মে, ২০১৬, কল-৯, পৃ. ২১২।
২৪। চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ। সময় বড় কম (কবিতা সমগ্র-৩)। আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, (চতুর্থ মুদ্রণ) এপ্রিল, ২০১৬, কল-৯, পৃ. ১৬।
২৫। চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ। সময় বড় কম (কবিতা সমগ্র-৩)। আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, (চতুর্থ মুদ্রণ) এপ্রিল, ২০১৬, কল-৯, পৃ. ২৫।
২৬। চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ। যাবতীয় ভালবাসাবাসি (কবিতা সমগ্র-৩)। আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, (চতুর্থ মুদ্রণ) এপ্রিল, ২০১৬, কল-৯, পৃ. ১১৯।
২৭। চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ। ঘুমিয়ে পড়ার আগে (কবিতা সমগ্র-৩)। আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, (চতুর্থ মুদ্রণ) এপ্রিল, ২০১৬, কল-৯, পৃ. ১৫৩।
২৮। তদেব, পৃ. ১৫৫।
২৯। চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ। জঙ্গলে এক উন্মাদিনী (কবিতা সমগ্র-৩)। আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, (চতুর্থ মুদ্রণ) এপ্রিল, ২০১৬, কল-৯, পৃ. ১৯৫।
৩০। চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ। আয় রঙ্গ (কবিতা সমগ্র-৩)। আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, (চতুর্থ মুদ্রণ) এপ্রিল, ২০১৬, কল-৯, পৃ. ২৬১।
৩১। চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ। চল্লিশের দিনগুলি (কবিতা সমগ্র-৪)। আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর, ২০০০, কল-৯, পৃ. ১১-২২।
৩২। চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ। কবি চেনে, সম্পূর্ণ চেনে না (কবিতা সমগ্র-৫)। আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর,২০১৮, কল-৯, পৃ. ১৬।

৩৩। চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ। কবি চেনে, সম্পূর্ণ চেনে না(কবিতা সমগ্র-৫)। আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর, ২০১৮, কল-৯, পৃ. ১৭।

৩৪। চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ। কবি চেনে, সম্পূর্ণ চেনে না (কবিতা সমগ্র-৫)। আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর, ২০১৮, কল-৯, পৃ. ২৫।

৩৫। https://bangodarshan.com/ratan/stock/JATO_DUREY_JAAI.pdf, পৃ. ২৬।

৩৬।https://boierthikana.com/static/pdf/kobita/Sunil%20Gangopadhyay%20er%20Shreshtho%20Kobita.pdf পৃ. ২৩।

৩৭। তদেব, পৃ. ৪৮।

৩৮।https://bangodarshan.com/ratan/stock/SARATKUMAR_MUKHOPADHYAYER_SHRESTHA_KABITA.pdf,পৃ. ৭

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-II, November, 2025, Page No. 335- 342
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.02W.215

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতায় ‘কবিতার’ প্রসঙ্গ

মিহির মজুমদার, *সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাধাগোবিন্দ বরুয়া মহাবিদ্যালয়, গুয়াহাটি, অসম, ভারত*
সঞ্জয় ভট্টাচার্য, *সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটি, অসম, ভারত*

Received: 19.11.2025; Accepted: 21.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Nirendranath Chakraborty was born in Faridpur, Bangladesh. Since childhood, he was fond of writing poetry, that is, playing the game of connecting words with words. He started writing and publishing poetry at the age of 16. His first published book is 'Neel Nirjan'. He has been writing poetry for a long time. He has done various experiments with poetry. He always tried to make poetry understandable to the common man. The poet's vision of life is very broad. Urban and rural life, nature, contemporary politics all find equal place in his poetry. Nirendranath Chakraborty is an unforgettable name in modern Bengali poetry. Many things are still unexamined in the discussion of his poetry. Like many other poets, he has written a lot about poetry, sometimes in verse and sometimes in prose. This is also a unique aspect of the poet's talent. He is a match for making poetry understandable to the common man. His poems are diverse in terms of thought and subject matter. He has experimented in creating the style of poetry. The ‘kabitar class’ book of about prosody is widely read. He has presented the beautiful and simple identity of Bengali rhythm. His poems are brilliant with the use of various rhythms, that is beyond words. The poet has thought a lot about the relationship between poetry and human life. We see the expression of that thought in many of his poems.

Keywords: Modern Bengali Poetry, Poetic Experimentation, Accessibility of Poetry, Human Life and Poetry, Rhythm and Prosody

কবিতার স্বরূপ নির্ণয়ে পৃথিবীর সকল কবিই ভাবনা-চিন্তা করেছেন। চর্যার (প্রাচীন বাংলার) কবিদেরও কিছুটা এমন ভাবনায় তাড়িত হতে দেখা যায়। ‘‘এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ’’[১] এই বাক্যবন্ধে কবি লুইপাদ কাব্যের পরিমিতির বিষয় অনুধাবনের চেষ্টা করেছেন। বাংলা কবিতার অন্তরমহলের কারুকাজ সম্পর্কে এমন সূত্র অন্যত্রও খুঁজে পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্র তাঁর অন্নদামঙ্গল কাব্যে যেমন বলেছেন, ‘‘অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল’’[২]। ভাষা কাব্যরস সমন্বিত হওয়া চাই, এই ছিল ভারতচন্দ্রের সিদ্ধান্ত। পরবর্তীকালে কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭) কবিতার স্বরূপ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। সেখানে তিনি ইংরেজ কবি মিলটনের একটি কবিতার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ‘‘Hence, loathed melancholy’’[৩]। প্রসঙ্গত তিনি বলেন— ‘‘আমাদিগের দেশের কবিতা, কোমল বনিতা, “রসেন মিলিতা” তাঁহার সহিত গাম্ভীর্য্যের কোনো সম্পর্ক নাই’’[৪]। অন্যত্র কবি তাঁর ‘পদ্মিনী উপাখ্যান’ কাব্যের ভূমিকায় বলেছেন— “ কবিতার আর এক গুণ এই, তাহা সুষুপ্তপ্রায় মানসিকবৃত্তিচয়কে সহসা জাগরিত এবং উত্তেজিত করিতে পারে।”[৫] বঙ্কিমচন্দ্রও কবিতা সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত মত ব্যক্ত করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের স্বরূপ অনুধাবনে

বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিরাও কবিতার মাহাত্ম্য উপলব্ধিজাত নানা বক্তব্য নানা সময়ে উপস্থাপন করেছেন। এঁদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ অন্যতম। জীবনানন্দের 'কবিতার কথা' বুদ্ধদেবের 'কালের পুতুল' গ্রন্থ দুটি আজও সমাদৃত। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'কাব্যের মুক্তি' প্রবন্ধে বলেছেন—

> ''কবির কর্তব্য তাঁর প্রতিদিনের বিশৃঙ্খল অভিজ্ঞতায় একটা পরম উপলব্ধির মাল্য রচনা। কবির উদ্দেশ্য তার চার পাশের অবচ্ছিন্ন জীবনের সঙ্গে প্রবহমান জীবনের সমীকরণ।''[৬]

সাহিত্য চিরকাল মানুষের কথা বলে এসেছে। মানুষের কল্পনা আশা আকাঙ্ক্ষা সাহিত্যে প্রকাশ পায়। কবি বিষ্ণু দে তাঁর 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' নামক প্রবন্ধে বলেছেন—

> ''সকল সচেতন মানুষের মধ্যেই তো অন্তরের ধ্যানখানি আপনার ভাষা খোঁজে। কিন্তু জীবনযাত্রার অমানুষিক রথচক্রঘর্ঘরে সে ভাষা ডুবে যায়, মন ভবিষ্যতে খুঁজে বেড়ায় তার সম্পূর্ণ বাণী।''[৭]

অন্যদিকে কবি জীবনানন্দ কবিতা সম্পর্কে ইংরেজ কবি অডেনের উক্তি 'memorable speech'— এই কথাকে খণ্ডন করে বলেছেন, কবিতার অবয়বে থাকবে ইতিহাসচেতনা ও পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান।[৮] কবিতা সম্পর্কে আলোচনায় পিছিয়ে নেই কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীও (১৯২৪ - ২০১৮)। এ সম্পর্কিত তাঁর দুটি বই খুবই উল্লেখযোগ্য। 'কবিতার দিকে ও অন্যান্য' এবং 'কবিতা কী ও কেন?' এই দুটি গ্রন্থে নীরেন্দ্রনাথ কবিতার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। আমরা এখানে তাঁর রচিত কবিতার কিছু পর্যালোচনা করতে চাই; বিশেষত যে কবিতাগুলোতে কবির কবিতা-সংক্রান্ত ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। আলোচনার সুবিধার জন্যে আমরা কবির ১৯৭১ থেকে ১৯৮৩ সময়কালে রচিত ও প্রকাশিত মোট ছয়টি কাব্য শুধু নির্বাচন করেছি।

১। 'উলঙ্গ রাজা' (১৯৭১) ২। 'খোলামুঠি' (১৯৭৪) ৩। 'কবিতার বদলে কবিতা' (১৯৭৬) ৪। 'আজ সকালে' (১৯৭৮) এবং ৫। 'পাগলা ঘন্টি' (১৯৮১) ৬। 'ঘর-দুয়ার' (১৯৮৩)

এই কাব্যগুলির কিছু কবিতায় 'কবিতার' প্রসঙ্গ বিবৃত হয়েছে। 'উলঙ্গ রাজা' কাব্যে মোট ৩৫টি কবিতা আছে। যার মধ্যে ৪ টি কবিতায় সরাসরি কবিতার প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। সেগুলি হল— ক) 'না এলে না-ই বা এলে' খ) 'প্রাকৃত বচন' গ) 'কাচের গুঁড়ো' ঘ) 'কবিতা '৭০'

'না এলে না-ই বা এলে' কবিতাটিতে কবির এক স্বীকারোক্তি প্রকাশ পেয়েছে। আবাল্য কবিতার সঙ্গে পরিচিত কবি হালে তার সাক্ষাৎ লাভ করছেন না। এ নিয়ে কবিমনে খানিকটা উদ্বেগ ও অভিমান মিশ্রিত হয়ে আছে। কবিতা কল্পনালতা বলে কবি মনে করেন না। রক্তমাংসের মূর্তিরই তিনি সন্ধানি। তাকে না পেলে শব্দের ভেতরে ফোটাতে হবে, এই কবির মত।

> ''তবে তাকে শব্দের ভিতরে
> সমূহ ফোটাতে হবে, না-ফোটালে এ-জন্মে আমার
> পরিত্রাণ নেই।''[৯]

কবি বলেছেন কবিতা তাঁকে যতই ধোঁকা দিক, চালাক মাছের মতো দূরে ঘোরাফেরা করুক, তাতে জেদ বেড়ে যায়। তিনি শব্দ নির্বাচনে সতর্ক হবার চেষ্টা করেন। তাঁর ডানে বাঁয়ে শব্দের পাহাড় জমে আছে। তা দিয়েই জোড় মেলাবার চেষ্টায় ব্রতী আছেন। তবে দুবার তিনি কবিতাকে দেখতে পেয়েছেন বলে ঘোষণা করেছেন এই বলে-

> ''একবার আগ্রার এক ভগ্ন মিনারের শীর্ষে সন্ধ্যার আগুনে
> একবার পুরীর
> দীপ্র মরকতকান্তি তরঙ্গমালায়।''[১০]

কবি তাঁর বাল্যস্মৃতির প্রসঙ্গ টেনে 'কবিতার দিকে' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে কবিতা তাঁর সহজাত ভাষা। গদ্য নয়। শব্দে-শব্দে জোড় মেলাবার খেলায় তিনি শৈশবে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।[১১]

তাঁর 'প্রাকৃত বচন' কবিতায় কবিতার শব্দ প্রয়োগ ও প্রতীক নির্বাচনের কথা আছে। বলছেন ব্যাধির ওষুধ প্রকৃতির ভিতরে রয়েছে বলেই বার বার কবিতায় প্রকৃতির প্রসঙ্গ ফিরে আসে। কবির ভাষায়—

> ''যদি শুদ্ধতার প্রতীক হিসেবে কবিতায়
> ফুলের উল্লেখ করো, তবে
> উদ্যানে-অরণ্যে গিয়ে চিনে নিতে হবে

কোনটা কোন্ ফুল''[১২]

'কাচের গুঁড়ো' কবিতাটি রূপকধর্মী। তাতে 'শব্দ' ভাষার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি। এই শব্দ সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে একীভূত। সাতের দশকের বাংলার রাজনৈতিক ডামাডোলের চিত্র এখানে পরিস্ফুট হয়েছে। মানুষের জীবনে বোমাবাজি সংক্রান্ত মৃত্যুর আতঙ্ক কীভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল তা-ই কবি একটি চিত্রকল্পের মাধ্যমে ধরতে চেয়েছেন।

''এবং কারা গদ্যে-পদ্যে
ঘুরছে-ফিরছে তারই মধ্যে,
তুলতে চাইছে নতুন করে দেবালয়ের চূড়ো।
আমরা দেখছি, তাদের
পায়ের তলায় ছড়িয়ে আছে ভাঙা কাচের গুঁড়ো''[১৩]

'কবিতা '৭০' কবিতাটি কবিতার বিচিত্র অভিব্যক্তি নিয়ে রচিত। কবিতা কত কথা বলে কীভাবে বলে, তার ফিরিস্তি দিয়েছেন কবি। মানুষের জীবন, ঘর-সংসার, জীবনের নানা টানাপোড়ন কীভাবে কবিতায় ব্যক্ত হয় তারই আশ্চর্য লেখ এই কবিতা। অধিকন্তু এই কবিতায় সাতের দশকের কলকাতার চালচিত্রের ছবি আছে।
কবি লিখেছেন—

''এক-একটা কবিতা যেন সুতানুটি-গোবিন্দপুরের
রাত্রিকে ফিরিয়ে আনে।
এক-একটা কবিতা যেন অকস্মাৎ
টান্ মেরে হটিয়ে দেয় ময়দানের সবুজ গালিচা
... ...
এক-একটা কবিতা যেন অকারণ আক্রোশে হঠাৎ
তরঙ্গে ডোবাতে চায়।''[১৪]

আমাদের আলোচনায় দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থটি হল 'খোলামুঠি'। এ কাব্যে মোট ৪৭টি কবিতা আছে। যার মধ্যে ৩টি কবিতায় কবিতার কথা আছে। কবিতা ৩টি হল— ক) নিজ হাতে, নিজস্ব ভাষায় খ) গোপন মুনিয়া গ) শব্দে-শব্দে টেরাকোটা। এই কাব্যে কবির আত্মপ্রত্যয় আরও দৃঢ় হয়েছে। রাজনৈতিক অস্থিরতা, বোমাবাজি, খুনজখম ইত্যাদিতে জীবনের যে অশুভ লক্ষণ ঘনিয়ে উঠেছিল চারপাশে তা যে মানুষকে শান্তি দিতে পারে না, সে-কথা প্রমাণিত হয়েছে। 'নিজ হাতে, নিজস্ব ভাষায়' কবিতায় কবি চিরন্তন ভালবাসার কথাই বলেছেন। বলছেন—

''স্নেহের চুম্বনখানি এঁকে দিতে ইচ্ছে হয়
সমস্ত শিশুর গালে''[১৫]

কেন না কবি জানেন ভালবাসা ছাড়া অন্য কোন কথা কবির কণ্ঠে মানায় না। তাই অত্যন্ত আবেগাপ্লুত কণ্ঠে কবি বলেন—

''ভালবাসা কবিতারই অন্য নাম।
যে-নাম হৃদয়ে তুমি উৎকীর্ণ করেছ, তাই জানো:
এখন সমস্ত মিথ্যা
কদর্য-অক্ষরে-লেখা সব গ্লানি ভুলবার সময়।
... ...
নিজস্ব ভাষায়
অঙ্কুরিত প্রতিটি বীজের কাছে নতজানু হয়ে
এখন বলবার লগ্ন:
গোপন থেকো না বৃক্ষ,''[১৬]

কিংবা 'গোপন মুনিয়া' কবিতায় কবি পাখির অনুষঙ্গে চরাচরের বিষাদের চিত্র অঙ্কন করেন। তাতে দেখা যায় চঞ্চল মুনিয়া পাখি উধাও হয়েছে। তাদের আকাশের সারাৎসার জানা হয়েছে কি না তা নিয়ে কবির সংশয়। সমস্ত শস্যের

স্বাদ না জেনেই সরে পড়েছে বুঝি। কোথায় বিবাদ। কোথায় রোদের আশ্লেষে বারুদের গন্ধ। এই দুশ্চিন্তা কবির মনে বিষাদের ছায়া আঁকে। পাখি কবির হৃদয়ে প্রবেশ করেছে। মুনিয়ার রূপকল্পে কবিতার শব্দ কবিহৃদয়ে ঠোকর মারছে।

''হঠাৎ ভিতরে গিয়ে লাগালি শব্দের এই ঠেলা?
চোখের সমুখে
এতক্ষণ যারা ছিল, এখন রয়েছে তারা বুকে।
বুকের ভিতরে শব্দ ওঠে-পড়ে,
বুকের ভিতরে
বর্ণের আগুন জ্বলে ধিকিধিকি:''[১৭]

'খোলামুঠি' কাব্যের কবিতা-বিষয়ক একটি উজ্জ্বল কবিতা 'শব্দে-শব্দে টেরাকোটা'। এখানে কবি বলেছেন যে যার নিজস্ব শিল্প সমূহ অর্জন করে নেয়। কবি তার শব্দকে অভিজ্ঞতার চুল্লির ভেতর ঠেলে দেন। এবং তাতে কিছু শব্দ অগ্নিকুণ্ডে ঝরে যায়। কিছু হরিচন্দনের ফোঁটা হয়ে গ্রীষ্মরাত্রির আকাশে জ্বলে। কিছু শব্দ দীর্ঘায়ু হতে চায়। কবিতা টেরাকোটা শিল্পের বিষ্ণুমূর্তির মতো অক্ষত হবার দাবি রাখে। এই অভীপ্সা কবিতাটিতে ঘোষিত হয়েছে।

''আমি কি তোমার কাছে সনন্দ নিয়েছি কবিতার,
যে আমি তোমার জন্যে যাব
পাতালে, অথবা ঊর্ধ্বে আকাশে ফোটাব
তোমারই আলেখ্য?''[১৮]

অন্যদিকে 'কবিতার বদলে কবিতা' বইয়ে ৪৯টি কবিতা আছে। যার মধ্যে ৫টি কবিতা এমন যেখানে কবি কবিতা নিয়ে কথা বলেছেন। কবিতাগুলো হল— ক) 'কবি' খ) 'কবিতার বদলে' গ) 'ভাষায়, ভালবাসায়' ঘ) 'একটি-দুটি' ঙ) 'একদিন এইসব হবে, তাই'

'কবি' নামক কবিতায় একটি আত্মজিজ্ঞাসা মূর্ত হয়ে উঠেছে। কবি গদ্যের সভায় গেলে তাঁর পা যেন টলে না যায়। কবির পক্ষে গদ্য রচনার সংকট এবং তা থেকে উত্তরণের মানসিক ও শৈল্পিক স্থিতি কতটা জরুরি হয়ে ওঠে তা-ই কবি বলতে চেয়েছেন। 'কবিতার বদলে' কবিতায় কবিতা কী তা নিয়ে এক লম্বা ফিরিস্তি কবি দিয়েছেন। কবিতা কী, এ প্রশ্নে অল্পবিস্তর সব কবিই তাড়িত হয়েছেন। নীরেন্দ্রনাথ বলতে চান কবিতা শোকে সান্ত্বনা দেয়, ভয়ে সাহস জোগায়। আনন্দ ও শান্তি দেয় কবিতা।[১৯] আলোচ্য কবিতাটিতে চিলের অনুষঙ্গ জীবনানন্দের 'হায় চিল' কবিতার কথা মনে করিয়ে দেয়। চিলের কান্নার সুরে প্রেমিকার ম্লানমুখ মনে পড়ে, যে-মুখ বেতের ফলের মতো করুণ। কবি নীরেন্দ্রনাথের ভাষায়—

''সূক্ষ্ম কি জটিল নয়, বরং বিমূর্ত সরলতা—
এইগুলি কবিতা নয়, যুদ্ধ কি মীমাংসা নয়, খেলা
ভেঙে দিয়ে চলে যাওয়া নয়।''[২০]

প্রকারান্তরে 'ভাষায়, ভালবাসায়' কবিতা কবি বলেন ভাষার মধ্যে অন্য এক ভাষা থাকে। তা বেগনিবর্ণ ভালবাসা। কবিতার ভাষা ভাষাকে ছাড়িয়ে যায়। অন্য এক সুন্দর অনুভূতিলোকে আমাদের নিয়ে যায়। সুখের মধ্যে সুখের অতীত নিভৃতলোক রচনা করে। কবি দৃঢ় কণ্ঠে উচ্চারণ করেন—

''ভাষার মধ্যে ভাষা, এবং পুনশ্চ সেই ভাষা...
একটা ছিল ওষ্ঠে তোমার, একটা ছিল বুকে,
সেই দুটোকে মিলিয়ে নিলেই হিসেবটা যায় চুকে
ভাষার।''[২১]

এই কাব্যের 'একটি-দুটি' কবিতায় দুটি বিপরীত ছবি আমরা পাই। আমাদের পরিপার্শ্বের মানুষজন সকলেই আত্মপরতায় মগ্ন। সেখানে সত্যিকার মানুষ দু-একজন। এ কথা সত্য। সচরাচর মানুষ পরদুঃখে কাতর হয় না। অন্যের বিপদে সহায়ক ভূমিকা পালন করে না। পাশ কেটে চলে যায়। অনুরূপ ভাবে কবিও একটি-দুটি মাত্র আছে। যাঁরা প্রকৃতার্থে কবি কেবল তাঁরাই সমূহের বিপদে ঝুঁকি নিয়ে ঝাপিয়ে পড়েন।

''ওই কবি তরঙ্গ ছিঁড়ে

অগাধ জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে,
অন্যেরা সব দাঁড়িয়ে তীরে
পরের পকেট হালকা করছে।''[২২]

একেবারে বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে আছে 'একদিন এইসব হবে, তাই' কবিতাটি। এখানে কবি বলছেন, সমস্ত যোদ্ধা বিষণ্ণ হবার মন্ত্র শিখে যাবে। মৃত্যুকালে বৃদ্ধ মানুষ সহজে বলতে পারবে যাই। কোনো পার্থিব বেদনা ছাড়াই। মানুষের ঘাম, পরিশ্রম, বিশেষ মাহাত্ম্য পাবে। নারী তার প্রেমের ভাষায় আহ্বান করবে। এবং এইসব জাগতিক জীবনের শুভবোধক বলেই কবিতা লেখা হয়। কবি বলেন—

''একদিন এইসব হবে বলেই এখনও
সূর্য ওঠে, বৃষ্টি পড়ে, এবং কবিতা লেখা হয়।''[২৩]

এই আলোচনার চতুর্থ কাব্য 'আজ সকালে'। এতে ৪৭টি কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তার মধ্যে কেবল ৩টি কবিতায় কবিতার প্রসঙ্গ আছে। কবিতা ৩টি হল- ক) একদা লিখতেন খ) ছবি গ) হেমলতা

'একদা লিখতেন' কবিতায় কবিজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উঠে এসেছে। তাতে কবিতার রচনা সংক্রান্ত খোশ গল্পে কবির যে আস্থা নেই তা সরাসরি প্রকাশ পেয়েছে। তিনি মনে করেন সকল কবিই এমন কিছু অবশ্যই লিখেছেন যা কালের বিচারে টিকে যাবে। এমন সিদ্ধান্তের পক্ষে আত্মপক্ষ সমর্থনের ভঙ্গিতে কবি স্বগতভাবে এমন প্রশ্ন নিজেকেও করেন। এবং তাঁর কবিতা লেখার কলমও যে একদিন শুকিয়ে তাতে তাঁর নিজের কোনো সন্দেহ নেই। তাই কবি মনে করেন নিজের শরীরে আগুন জ্বালিয়ে যে-কবি কবিতা রচনা করে চলেছেন সে-কবিকে কিছু শেখানোর চেষ্টা করা একেবারে উচিত নয়। অন্যদিকে 'হেমলতা' কবিতায় প্রায় ব্যর্থ হতে চলা একটা প্রেমের সম্পর্কের বিপর্যাসে কবি কবিতার নির্মাণের অধ্যবসায়ের কথা বলেন।

''বাতাসে আগুনে জলে উদয়াস্ত আজও মায়াজাল
টেনে যাচ্ছি, জোড়-মেলানো কথা
যদি পাই, তোমাকেই দেব।''[২৪]

আমাদের উদ্দিষ্ট আলোচনায় নির্বাচিত পঞ্চম কাব্য 'পাগলা ঘন্টি' কাব্যে মোট ৪১টি কবিতা আছে। এর মধ্যে ৬টি কবিতায় কবিতার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। সেগুলি হল— ক) 'কবিতা হয় না' খ) 'কবিতার পাণ্ডুলিপি' গ) 'ঝড়বাদলে' ঘ) 'কবিরা যখন' ঙ) 'কবির নিয়তি' চ) 'শব্দ,শুধু শব্দ'

'কবিত হয় না' কবিতায় কবিতার হয়ে ওঠার রসায়ণের প্রসঙ্গ খুব সহজ ভাষায় কবি ব্যক্ত করেছেন। কবিতায় বিশেষ কথা কীভাবে নির্বিশেষ হয়ে ওঠে তা অলঙ্কারশাস্ত্রে বর্ণিত আছে। কাব্যের আত্মা তার ধ্বনি। যাকে বলা হয় বাচ্যাতিরিক্ত ভাবের ব্যঞ্জনা। কবিতার আপ্ত জিজ্ঞাসা- হিংসা কাকে উন্মাদ করেছে, কোন মানুষকে, সেই বিশেষ মানুষকে কবিতা নির্বিশেষ করে তুলতে বদ্ধপরিকর।

'কবিতার পাণ্ডুলিপি' কবিতায় একটি কবিতার সম্পূর্ণ হয়ে ওঠার অভিজ্ঞান রচনা করতে চেয়েছেন কবি। জীবনের ছোট বড় নানা অভিঘাতে কবিতা আন্দোলিত হয়। বন্ধু ও স্বজনবর্গ দূরে সরে যায়। কখনো এমন হয়, একদা অর্থবহ শব্দ অর্থহীনতায় ডুবে যায়। শিল্পীর জীবনেও এমনটাই ঘটে। এখানে প্রত্যাশা ও বিদ্রূপ সমান্তরাল হাঁটে। কখনো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে নষ্ট ভাষা। এতকিছু বৈপরীত্যের মধ্যে থেকেই একটি কবিতা জন্ম লাভ করে। কবির আত্মস্খলনও ঘটে। নিজের ভাবমূর্তি প্রকাশের তাগিদে শাসকের পদলেহন করে। এটা কবিতার জগতে এক বিচ্ছিরি রোগ, এমনই মনে করেন কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।[২৫] 'কবির নিয়তি' কবিতায় এমন আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করেছেন কবি। নিয়তির গুলি কবির পায়ে বিঁধলে তিনি স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারেন না। শব্দগুলি তখন কবিকে ধোঁকা দেয়। একটা সময় কবি আর দিগ্বিজয়ের স্বপ্ন দেখেন না। তখন সরাইখানায় বসে কেবল ''কেউ কিসসু লিখতে পারে না...''[২৬] বলে থুতু ছেটান। কিন্ত হতচ্ছবি কবির কাম্য নয়। তাই যে হাজার শব্দ মাথায় ও বুকে ছিল তাকেই কবি কুড়িয়ে তোলেন নতুন করে জোড় মেলানোর জন্যে। কবিতার ভুলগুলি মুছে ফেলার জন্যে।

এবার 'ঘর-দুয়ার' কাব্যের প্রসঙ্গে বলতে হয়, এখানে ৩৯ টি কবিতা অন্তর্ভুক্ত আছে। এর মধ্যে কবি ৪ টি কবিতায় কবিতার প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। কবিতাগুলি হল— ১। 'আমরা ক'জন' ২। 'মধ্যরাতে উন্মাদেরা' ৩। 'খেলোয়াড়ের টুপি' ৪। 'মর্জিমতন'

'আমরা ক'জন' কবিতায় কবির কাঙ্ক্ষিত শব্দ সন্ধানের প্রসঙ্গ আছে। সূর্যোদয়ের কথা আছে। যে-সূর্যোদয় মানব জীবনের গভীরে আলো ফেলবে। জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য ধরা পড়বে। কবিতাটিতে 'মাঘ রাত্রের' অন্ধকার আকাশ ভেদ করার রূপক মুলত জীবনের আঁধার বিলোপের বার্তাবহ। কবির ভাষায়—

"সেই কথাটাই একটুখানি
অন্যভাবে বলতে চাই;
বলব, যদি অন্যরকম
শব্দাবলীর নাগাল পাই।"[২৭]

কবিতাটিতে অন্ধকারের অনুষঙ্গে কবির শব্দ সন্ধান থেকে এটা অনুভব করা যায়, কবিতার শব্দের প্রতি কবির অপার মায়া। এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে-শব্দ অন্যরকম তার বিশেষত্ব অনেকখানি। তা দিয়ে নিভৃত সংলাপ তৈরি হতে পারে। সেই কথা সূর্যোদয়ের মতো সত্য। জীবনপথের দিশারি।

'মধ্যরাতে উন্মাদেরা' কবিতায় কবি লিখছেন শব্দ-সমাহারে যজ্ঞ যুদ্ধ প্রণয় হিংসার ফলাফলের সুত্র খুঁজে মরে উন্মাদেরা। এখানে শ্লেষের ভঙ্গিতে কবিমাত্রের আত্ম-জিজ্ঞাসার কথাই বলেন তিনি। কবিতা শব্দশিল্প। শব্দের কারুকাজে কবিতার রূপমূর্তি প্রকাশ পায়। কবির মনোবেদনার একটি কারণ এই প্রকৃত শব্দটি চয়ন করার ব্যর্থতা। দীর্ঘ কবিতাযাপনে তিনি অনুভব করেন, বহু শব্দ বহুধা ব্যবহৃত। যেমন তিনি লিখেন—

"কিছু শব্দ ডুবে গেছে সমুদ্রের রূপবর্ণনায়;
কিছু শব্দ লটকে আছে অশথের ডালে;
বৈকালী হাওয়ায়
ভো-কাট্টা ঘুড়ির মতো কিছু শব্দ দৃষ্টির আড়ালে
চলে যাচ্ছে; কম্পজ্বরে আর
অন্ত্রের ব্যাধিতে ভুগছে কিছু শব্দ ওই।
অন্যদিকে, গুরুবন্দনার
মন্ত্র হয়ে উঠতে গিয়ে কিছু শব্দ গম্ভীর বড়ই।"[২৮]

কবির দরদী হৃদয়ের স্বরূপ এখানে ধরা পড়ে। কবিতার প্রতি আত্মমগ্ন থেকে চরাচরে চোখ তুলে দেখছেন। কোথায় কাব্য লুকনো আছে। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছিলেন, কবিরে পাবে না তাহার জীবন চরিতে। কবির মনোভূমি রামের জন্মস্থান অযোধ্যার চেয়েও সত্য। কবির কল্পদৃষ্টি সাধারণ নয়। তিনি সত্যের আবিষ্কারক। তাঁর দেখার ভঙ্গির মধ্যে লুকিয়ে থাকে নতুনকে জানার অভিব্যক্তি। 'খেলোয়াড়ের টুপি' কবিতায় ভাষার বাঁক বদলের ইঙ্গিত পাই। শব্দ-নির্ভরতার আঁচল থেকে শব্দহীন মূক সৌন্দর্যের দিকে কবি যাত্রা করতে চান। অন্তরে বাজছে ফেরার বাঁশি। বলা যায় উৎসে ফেরার ডাক কবি শুনতে পেলেন। "গন্ধ ফিরে যাচ্ছে ফুলের মধ্যে"[২৯], এই যাত্রা পরিপার্শ্ব জুড়ে, তা অবলোকন করেছেন কবি। তবে কবি মর্জিমতন চলতেই পছন্দ করেন। একবার নীরেন্দ্রনাথ সগর্বে বলে উঠেছিলেন—

"তা হলে আপনারা জেনেই রাখুন যে,
আপনাদের জন্যে আমি
লিখি না। বরং,
বাবুমশাইরা,
আপনারা যে সর্বদা আমাকে
নজরবন্দি করে রেখেছেন, এবং
তা সত্ত্বেও যে আমি এখনও
আমারই মর্জিমতন
লিখতে পারছি, লিখে যাচ্ছি,

এইটে ভেবে মাঝেমধ্যে আমার একটু
গর্বই হয়।"[৩০]

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতায় 'কবিতা'র প্রসঙ্গ নানা ভাবে এসেছে। কবিতার শরীর নির্মাণের কথা, কবিতার স্বরূপ এবং কবিতার গুরুত্ব, মানব জীবনে কোথায় এবং কতটা, এমন বহুবিধ প্রতর্ক কবি উত্থাপন করেছেন। প্রসঙ্গত আমাদের মনে পড়ে 'কবিতার ঘর ও বাহির' গ্রন্থে পূর্ণেন্দু পত্রী অনুরূপ একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "পৃথিবীর আলোয় ছন্দোবদ্ধ পদাবলীর যেদিন প্রথম জন্ম, সেদিন থেকেই সাহিত্যের এই মায়াবী সন্তানটির দিকে মানুষের কৌতূহল এবং কৌতুক, স্নেহ এবং সন্দেহ, বৈরাগ্য এবং ব্যাকুলতার মাত্রা প্রায় সমান সমান।"[৩১] নীরেন্দ্রনাথের গদ্য আলোচনাগুলি ছাড়াও কেবল কবিতার মধ্যে কবিতার স্বরূপের নানা কথা ও ইশারা আছে। যা তাঁর কাব্য আলোচনার ক্ষেত্রে বিশেষ পরিসর দাবি করে।

তথ্যসূত্র:

১. সেন, সুকুমার। চর্যাগীতি-পদাবলী। সাহিত্য সভা, বর্ধমান, মডার্ন আর্ট প্রেস, কল-১, ১৯৫৬, পৃ. ৪৮।
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ এবং দাস, শ্রীসজনীকান্ত। ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী (প্রথম ভাগ)। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৪৯, পৃ. ৪৮৫।
৩. https://allpoetry.com/L'Allegro
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, রঙ্গলাল। বাংলা কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধ। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা-৬,২০০৯ পৃ. ৪৪।
৫.https://ia800807.us.archive.org/5/items/in.ernet.dli.2015.338558/2015.338558.Rangalal-Bandyopadhyayer.pdf পৃ-১৬
৬. দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ। স্বগত। ভারতী ভবন, কল-১২, প্রথম সংস্করণ, ১৩৪৫, পৃ. ২২।
৭. দে, বিষ্ণু। সাহিত্যের ভবিষ্যৎ। সিগনেট প্রেস, কলকাতা-২০, প্রথম সংস্করণ, ১৩৫৯, পৃ. ৪০।
৮. দাশ, জীবনানন্দ। কবিতার কথা। সিগনেট প্রেস, কলকাতা-২৩, ১০ম সংস্করণ, ১৪১৩, পৃ. ৩৩।
৯. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ। কবিতাসমগ্র-২। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা-৯ প্রথম সংস্করণ, ৭ম মুদ্রণ-২০১৬, পৃ. ১৬।
১০. তদেব, পৃ. ১৬।
১১. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ। কবিতার দিকে ও অন্যান্য রচনা। পুনশ্চ, কলকাতা-৯, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯২, পৃ. ১৫।
১২. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ। কবিতাসমগ্র-২। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা-৯ প্রথম সংস্করণ, ৭ম মুদ্রণ-২০১৬, পৃ. ১৭।
১৩. তদেব, পৃ. ২৫।
১৪. তদেব, পৃ. ২৯।
১৫. তদেব, পৃ. ৬০।
১৬. তদেব, পৃ. ৬১।
১৭. তদেব, পৃ. ৬৫।
১৮. তদেব, পৃ. ৭৯।
১৯. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ। কবিতার কী ও কেন। দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ চতুর্থ সংস্করণ ১৯৯৮, পৃ. ৩৪।
২০. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ। কবিতাসমগ্র-২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা-৯ প্রথম সংস্করণ, ৭ম মুদ্রণ-২০১৬, পৃ. ১০১।
২১. তদেব, পৃ. ১১২।
২২. তদেব, পৃ. ১১৫।
২৩. তদেব, পৃ. ১২০।
২৪. তদেব, পৃ. ১৫৭।

২৫. তদেব, পৃ. ১৮৪।
২৬. তদেব, পৃ. ১৯৭।
২৭. তদেব, পৃ. ২০৩।
২৮. তদেব, পৃ. ২০৬।
২৯. তদেব, পৃ. ২১৪।
৩০. তদেব, পৃ. ২২৪।
৩১. পত্রী, পূর্ণেন্দু। কবিতার ঘর ও বাহির। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৩, পৃ. ১১।